Chacha Kahini by Syed Mujtoba Ali

suman_ahm@yahoo.com

চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

কর্ণেল

কুরফুর্স্টেন্-ডাম্ বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইয়োরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবানীতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা; ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্-ডামের গা ঘেঁষে উলাণ্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার।

বহু জর্মন অজর্মন 'হিন্দুস্থান হৌসে' আসত। জর্মনরা আসত নূতনত্বের সন্ধানে--কলকাতার লোক যে রকম চাইনীজ বা 'আমজদিয়ায়' খেতে যায়। ভারতীয়েরা নিয়ে আসত জর্মন, অজর্মন বান্ধবীদের—মাছ-ভাত বা ডাল-রুটির স্বাদ বাৎলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ করার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না ভারতীয় রান্নার চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণীর সত্তা যে তার সঙ্গে শুধু ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যে রকম প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণ ও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জর্মনদের কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই করা যায় না। কারণ ভারতীয় রান্নার বর্ণনাতে আছে ঃ—

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে।

এবং সে গ্রান্তারী রান্না কেন, মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে-খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। আর মশলা না দিলে আমাদের ঝোল হয়ে যায় আইরিশ স্টু, ডাল হয় লেন্টিল সুপ, তরকারি হয় বয়েল্ড ভেজ, মাছভাজা হয় ফ্রাইড্ ফিশ্। আমাদের চতুর্বর্ণ তখন শুধু বর্ণ নয়, রস-গন্ধ-স্বাদ সব কিছু হারিয়ে একই

sumanamm@yahoo.com

বিস্বাদের আসনে বসেন বলে চণ্ডালের মত হয়ে যান। কাজেই আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।

তবে হাঁ, আমাদের ছানার সন্দেশ ছিল কান্টের কাটেগরিশে ইম্পেরাটিফের মত অলঙ্ঘ্য ধর্ম। তার সামনে জর্মন অজর্মন সকলেই মাথা নিচু করতেন। ছানা-তত্ত্বে অবাঙালীদের অবদান অনায়াসে অবহেলা করা যেতে পারে।

'হিন্দুস্থান হৌসে'র সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা। হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের পরেই বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত বস্তু ছিল চাচার বেশ—তার সঙ্গে 'ভূষা' শব্দ জুড়লে চাচার প্রতি অন্যায় করা হবে। সে বেশ ছিল সম্পূর্ণ বাহুল্য বর্জিত।

কারখানার চোঙার মত গোলগাল পাতলুন, গলা-বন্ধ হাঁটু-জোকা কোট আর ভারী-ভারী এক জোড়া মিলিটারি বুট। লোকে সন্দেহ করত, তাঁর কোটের তলায় কামিজ-কুর্তা নাকি নেই। তবে এ-কথা ঠিক কোট, পাতলুন, বুট ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় আবরণ বা আভরণ তাঁর শ্যামাঙ্গে কেউ কখনো বিরাজ করতে দেখে নি। বার্লিনের মত পাথর-ফাটা শীতেও তিনি কখনো হ্যাট, টুপি, ওভারকোট বা দস্তানা পরেন নি। খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল কিন্তু চাচা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেই অপরূপ পাতলুন, গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু গলাবন্ধ কোট, আর একমাথা বাবরী নিয়ে চাচা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেন কুরফুর্স্টেন্-ডামের ফুটপাতে। পেছনের দিকে মাথা ঠেলে, উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন উড়ন্ত মেঘের পানে। কেন, কে জানে? হয়ত বিদেশের অচেনা-অজানা দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে একমাত্র আকাশ আর মেঘই তাঁকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দেশ ছেড়েছেন বহুকাল হল, কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করলে হাঁ, না, কিছু কবুল না করে কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মত শুধু বলতেন 'ললাটঙ্ক লিখন।'

বার্লিনের লোক শহরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করে না। দু'মিনিট যেতে না যেতেই চাচার চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। তাঁর অদ্ভুত বেশ, বাবরী চুল, ঘনশ্যাম দেহরুচি আর বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য না করে থাকবার যো ছিল না।

ফিসফিস শুনেই চাচার ঘুম ভাঙত। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে 'বাও' করে একটু মৃদু হাসির মেহেরবানী দেখাতেন। ভিড় তখন ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিত। চাচা আবার 'বাও' করে 'হিন্দুস্থান হৌস' রওয়ানা দিতেন। কেউ 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত) ধরনের কিছু বললে বা পরিচয় করবার চেষ্টা দেখালে চাচা গলাবন্ধ কোটের ভেতর হাত চালিয়ে তাঁর একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরে ফের 'বাও' করতেন —যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নবাব কাউকে ডুয়েলে আহ্বান করছেন। সে-কার্ডে

চাচার ঠিকানা থাকত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র। জর্মনরা চালাক ; বুঝত, চাচা রাস্তার মাঝখানে নীরব কাব্য করেন বলে কথা বলতে চান না। কাজেই তারা চাচার আড্ডায় এসে উপস্থিত হত।

মেঘ দেখবার জন্য অন্য জায়গা এবং অন্য কায়দা থাকতে পারে কিন্তু 'হিন্দুস্থান হৌসে'র রান্নার খুশবাই ছাড়বার জন্য এর চেয়ে ভালো গ্যোবেল্‌স্‌ আর কি হতে পারে?

শ্রীধর মুখুর্য্যে বলছিল, 'সংস্কৃতের নূতন ছোকরা প্রফেসর এসেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পড়াচ্ছে গীতা। আজ সকালে প্রথম অধ্যায় পড়াবার সময় বলল, 'কুলক্ষয়-ফুলক্ষয় সব আবোল-তাবোল কথা। বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতের উন্নতি হয় না।' তার থেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে গীতার প্রথম অধ্যায়টা গুপ্তযুগে লেখা। বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধ যুগের পূর্বে ছিল না।

চাচা বললেন, 'কি করে বর্ণসঙ্কর হয়, আর তার ফল কি, সেটা প্রথম অধ্যায়ে বেশ ধাপে ধাপে বাৎলানো হয়েছে না রে? বল তো, ধাপগুলো কি?'

শ্রীধর খাবি খাচ্ছে দেখে আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'কুলক্ষয় থেকে কুলধর্মনষ্ট, কুলধর্মনষ্ট থেকে অধর্ম, অধর্ম থেকে স্ত্রীলোকদের ভিতর নষ্টামি, নষ্টামি থেকে বর্ণসঙ্কর হলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ—'

মুখুয্যে বাধা দিয়ে বলল, 'হাঁ, হাঁ, প্রফেসর বলছিল, ''পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থবুদ্ধির লোক''?'

বিয়ারের ভিতর থেকে সূয্যি রায়ের গলা বুদ্বুদের মত বেরলো, 'ছোকরা প্রফেসর ঠিক কথা বলেছে। বর্ণসঙ্কর ভালো জিনিস। মুখুয্যে বামুনের ছেলে, এদিকে গীতার পয়লা পাঠ মুখস্থ নেই; সরকার কায়েতের ছেলে, পুরো চেনটা বাৎলে দিলে। মুখুয্যের উচিত সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে কুলধর্ম বাঁচানো।'

চাচা বললেন, 'ঠিক বলেছ, রায়। তাহলে তুমি এক কাজ কর। তোমার বিয়ারে একটু জল মিশিয়ে ওটাকে বর্ণসঙ্কর করে ফেলো।'

রায় রীতিমত শকট্‌ হয়ে বললেন, 'পালশাস্ত্রে এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর কিছুই হতে পারে না। বিয়ারে জল!'

চাচা মুখুয্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের নয়া প্রফেসরটা নিশ্চয়ই ইহুদি। ওরা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন জাতটাকে খাঁটি রাখবার জন্য, ঠিক তেমনি আর পাঁচজনকে উপদেশ দেয় বর্ণসঙ্কর ডেকে আনবার জন্য। ওদিকে খাঁটি জর্মন এ সম্বন্ধে উচ্চবাক্য করে না একদম, কিন্তু কাজের বেলায় না খেয়ে মরবে তবু বর্ণসঙ্কর হতে দেবে না।'

সরকার জিজ্ঞস করল, 'এদেশেও নিরম্বু-উপবাস আছে নাকি?'

চাচা বললেন, 'আলবাৎ, শোন। আমি এ-বিষয়ে ওকীব-হাল।'

পয়লা বিশ্বযুদ্ধের পর হেথায় অবস্থা হয়েছিল 'জর্মনির সর্বনাশ, বিদেশীর পৌষ মাস।' ইনফ্লেশনের গ্যাসে ভর্তি জর্মন কারেন্সির বেলুন তখন বেহেশ্‌তে গিয়ে পেঁ ৗচেছে—বেহেশ্‌তটা অবশ্যি বিদেশীদের জন্য, জর্মনরা কেউ পাঁচহাজার কেউ দশহাজারে বেলুন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। আত্মহত্যার খবর তখন আর কোনো কাগজ ছাপাত না, নারী হৃদয় ইকনমিক্সের কমডিটি, এক 'বার্' চকলেট দিয়ে একসার ব্লগু কেনা যেত, পাঁচটাকায় 'ফার' কোট, পাঁচশ' টাকায় কুরফুর্স্টেন্-ডামে বাড়ি, একটাকায় গ্যোটের কমপ্লীট ওয়ার্কস্।'

আড্ডার সবাই সেই সর্বনাশী পৌষ মাসের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চাচা বললেন, 'সেই ঝড়ে তখনো যে সব বাড়ি দড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-গেস্ট। যে-সব জর্মন পরিবারে বিদেশীরা পেয়িং-গেস্ট হয়ে বসবাস করছিল তাদের প্রায় সকলেই খেয়ে পরে জান বাঁচাতে পেরেছিল, কারণ যত নির্লজ্জ, কঞ্জুস, সুবিধাবাদী, পৌষমাসীই হও না কেন তামাম মাসের ঘরভাড়া, খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। বিদেশী টাকার তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় তোমাকে নিয়ে একটা পরিবারের কায়ক্লেশে দিনগুজরান হয়ে যেত।'

গোঁসাই গুন গুন করে গান ধরলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, তোমার সেই নত্তুন বয়সের কালে।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু একটা দেশের দুর্দিনে এক সের ধান দিয়ে পাঁচ সের চাল নিতে আমার বাধত। তাই যখন আমার বুড়ো ল্যাণ্ডলেডি একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল তখন আমাকে লুফে নেবার জন্য পাড়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন সময় আমার বাড়িতে একদিন এসে হাজির ফ্রলাইন্ ক্লারা ফন্ ব্রাখেল।'

আড্ডা এক গলায় শুধাল, 'হকি-টিমের কাপ্তান?'

চাচা বললেন,' আমার জান-বাঁচানে-ওয়ালী।' বললেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবাগঙ্গারাম), তুমি যদি অন্যত্র কোথাও না গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠো তা হলে আমি বড় খুশী হই। প্রাশান ওবের্স্টের (কর্ণেলের) বাড়ি, একটু সাবধানে চলতে হবে। এককালে খুব বড় লোক ছিলেন, এখন 'উন্‌জর টেগ্‌লিশেস্ ব্রট্ গিব্‌উন্‌স্ হয়টে' (Give us this day our daily bread)। অথচ এমন দম্ভী যে পেয়িং-গেস্টের কথা তোলাতে আমাকে কোর্ট মার্শাল করতে চায়। শেষটায় যখন বললুম তুমি প্রাশান কারো কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের জর্মন শেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে বার্লিন এসেছ তখন ভদ্রলোক মোলায়েম হল। এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে বললুম। তুমি ভাবটা দেখাবে যেন তাঁর বাড়িতে উঠতে পেরে কৃতার্থম্মন্য হয়েছ; তুমি যে কোনো উপকার করছ সেটা যেন ধরতে না পারেন। তার বউ সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনা

ক'রো না, তিনি সব বোঝেন, জানেন।

চাচা বললেন, 'প্রাশান অফিসারদের আমি চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছি। দূর থেকে ব্যাটাদের ধোপাদুরস্ত ইস্ত্রি-করা স্টিফ ইউনিফর্ম আর স্টিফ ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে এরা যেন হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল। সার্জেনরা কাটে নির্বিকার চিত্তে রোগীর পেট, এরা কাটে পরমানন্দে ফ্রান্সের গলা।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু ফন্ ব্রাখেলের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলুম।' এবং মনে মনে ভাবলুম বেশীর ভাগ ভারতীয় বসবাস করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দেখাই যাক না খানদানীরা থাকে কি কায়দায়।

ফন্ ব্রাখেল আমাকে নিয়ে যান নি। খবর দিয়ে আমি একাই একদিন সুটকেস নিয়ে কর্ণেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি পেঁছিলুম।

ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল তার চেহারা আগের দেখা থাকলে ফন্ ব্রাখেলের প্রস্তাবে আমি রাজী হতুম কি না সন্দেহ। বাড়ি তো নয় সে এক রাজপ্রসাদ। এ বাড়িতে তো অন্ততঃ শ'খানেক লোকের থাকার কথা কিন্তু তাকিয়ে দেখি দোতলার মাত্র দু'তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা। সামনে প্রকাণ্ড লন্। পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘন্টা বাজালুম। মিনিট তিনেক পরে যখন ভাবছি আবার ঘন্টা বাজাবো কি না তখন দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

গহরজান যখন পানের পিক গিলতেন তখন নাকি গলার চামড়ার ভিতর দিয়ে তার লাল রঙ দেখা যেত। যে-রমণীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম তাঁর চামড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখচ্ছবি দেখে মনে হল তিনি যেন সকাল বেলাকার শিশির দিয়ে গড়া। জর্মনিতে পান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার মনে হল ইনি পান খেলে নিশ্চয়ই পিকের রঙ এঁর গলার চামড়ায় ছোপ লাগাবে। চুল যেন রেশমের সুতো, ঠোঁট দু'খানি যেন প্রজাপতির পাখা, ভুরু যেন উড়ে-যাওয়া পাখী, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে সন্দেহ হয় ইনি দাঁড়িয়ে আছেন না হাওয়ায় ভাসছেন। প্রথম দিনেই যে এসব কিছু লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়; কিন্তু আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন তাঁর ঐ চেহারাই মনে পড়ে।

ইংরিজিতে বোধহয় একেই বলে ডায়াফনাস্; 'আস্বচ্ছ' বললে ঠিক মানে ধরা পড়ে না।

কতক্ষণ ধরে হাবার মত তাকিয়েছিলুম জানিনে, হঠাৎ শুনলুম 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত), আপনার আগমন শুভ হোক। আমি ফ্রাউ (মিসেস) ডুটেন্‌হফার।'

ভাগ্যিস ভারী মালপত্র ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির হাতে আগেই সমঝে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তা না হলে মাল নিয়ে আমি বিপদে পড়তুম। এ রকম আবস্থায় চাকর দাসী কেউ না কেউ আসে কিন্তু কেউ যখন এল না তখন বুঝতে পারলুম ডুটেন্‌হফারদের দুরবস্থা কতটা চরমে পেঁচেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডজন খানেক হল পেরুলুম—কোথাও

একরত্তি ফার্নিচার নেই, দোর জানালার পর্দা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম, এককালে নিশ্চয় বিস্তর ছবি ঝোলানো ছিল, মেঝের অবস্থা দেখে বুঝলুম এ-মেঝের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়ে নি—জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল। কঙ্কাল থেকে পূর্ণাবয়ব মানুষের যতখানি ধারণা করা যায় দেয়ালের হুকের সার, ছাতের শেকলের গোছা, দরজা-জানালার গায়ে-লাগানো পরদা-ঝোলানোর ডাণ্ডা থেকে আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা, বাজিঘরের ততখনি আন্দাজ করলুম।

শূন্য শ্মশান ভয়ঙ্কর, কিন্তু কঙ্কালের ব্যঞ্জনা বীভৎস।

এ-বাড়িতে থাকব কি করে? চুলোয় যাক প্রাশান জর্মন শেখা।

আন্দাজে বুঝলুম যে আমার জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বাড়ির প্রায় ঠিক মাঝখানে। ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার আমাকে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বজরার মত খাট, কিন্তু ঘরখানাও বিলের মত। নৌকোয় চড়া অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত বিলের মাঝখানে নৌকোয় ঘুমুতে যে-রকম অসহায় অসহায়, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে সে-খাটে শুয়ে আমারো সেই অবস্থা হয়েছিল।

দুপুরে খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বেন্‌কুয়েট টেবিলে তিনজনের জায়গা। টেবিলের এক মাথায় কর্তা, অন্য মাথায় গিন্নী, মাঝখানে আমি। একে অন্যকে কোনো জিনিস হাত বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই বলে তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। মাস্টার্ড, সস মাথায় থাকুন, গোলমরিচেরও সন্ধান নেই। বুঝলুম পাঁড় প্রাশানের বাড়ি বটে ; আড়ম্বরহীনতায় এদের রান্নার সামনে আমাদের বালবিধবার হবিষ্যান্নও লজ্জায় ঘোমটা টানে। কিন্তু ওসব কথা থাক, এ রকম ধারা মশলার বিরুদ্ধে জেহাদ আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি।

ভেবেছিলুম বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূয়ারের মত হোঁৎকা, টমাটোর মত লাল, অসুরের মত চেহারা, দুশমনের মত এই-মারি-কি-তেই-মারি অর্থাৎ সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে প্রাশান বিভীষিকা, কিন্তু যা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু ইয়োরোপে নেই।

এ যেন নর্দমা-পারের সন্ন্যাসী বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না বসে চেয়ারে বসেছেন।দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে—শিরদাঁড়া খাড়া, চেয়ারে হেলান দেন নি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্কমুখ, আর সেই শুকনো মুখ আরো পাংশু করে দিয়েছে দু'খানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় এতটুকু খাঁজ খায়নি আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মত। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নীচে,

চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা, নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল। সে-চোখে যেন এতটুকু লুকোনো জিনিস নেই। যত বড় অবিশ্বাস্য কথাই এ লোকটা বলুক না কেন, এর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অবিশ্বাস করার জো নেই।

খেতে খেতে সমস্তক্ষণ আড়-নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন চোখের দিকে, সেই বিষণ্ন ঠোঁটের দিকে আর চিন্তাপীড়িত ললাটের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছি। তখন চোখে পড়ল তাঁর খাবার ধরন।চোয়াল নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, খাবার গেলার সময় গলায় সামান্যতম কম্পনের চিহ্ন নেই।

পরনে প্রশান অফিসারদের য়ুনিফর্ম তো নয়ই, মাথার চুলও কদম-ছাঁট নয়। ব্যাকব্রাশ করা চক্‌চকে প্ল্যাটিনামব্লণ্ড চুল।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় মনে হল এঁর বয়স। চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর হতেও বাধা নেই। বয়সের আন্দাজ করতে গিয়েই বুঝলুম নর্মদা পারের সন্ন্যাসীর সঙ্গে এঁর আসল মিল কোনখানে।

এত অল্প খেয়ে মানুষ বাঁচে কি করে, তাও আবার শীতের দেশে? সুপ খেলেন না, পুডিং খেলেন না, খাবার মধ্যে খেলেন এক টুকরো মাংস—শ্যামবাজারের মামুলী মটন-কট্‌লেটের সাইজ—দুটো সেদ্ধ আলু, তিনখানা বাঁধাকপির পাতা আর এক স্লাইস রুটি। সঙ্গে ওয়াইন, বিয়ার, জল পর্যন্ত না।

আহারে যত না বিরাগ তার চেয়েও তাঁর বেশী বিরাগ দেখলুম বাক্যালাপে। নূতন বাড়িতে উঠলে প্রথম লাঞ্চের সময় যে-সব গতানুগতিক সম্বর্ধনা, হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা, সিঁড়ির পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে খবরদারি সে-সব তো কিছুই হল না—আমি আশাও করি নি—আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রতা-দুরস্ত কৌতূহল, এ সব কোনো মন্তব্য বা প্রশ্নের দিক দিয়ে হের ওবের্স্ট (কর্ণেল মহাশয়) গেলেন না। আমিও চুপ করে ছিলুম, কারণ আমি বয়সে সক্কলের ছোট।

খাওয়ার শেষের দিকে যখন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি যে, ডুটেন্‌হফারদের জিভে হয় ফোস্কা নয় বাত, তখন হের ওবের্স্ট হঠাৎ পরিষ্কার ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেক্সপীয়ারের কোন নাট্য আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?'

আমার পড়া ছিল কুল্লে একখানাই। নির্ভয়ে বললুম, 'হ্যামলেট।'

'গ্যোটে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্প।'

'একসঙ্গে গ্যোটে পড়ব?'

আমি আনন্দের সঙ্গে, অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালুম । মনে মনে বললুম, 'দেখাই যাক্ না প্রাশান রাজপুত কি রকম কালিদাস পড়ায়। হের ওবের্স্টের চেহারাটি যদিও ভাবুকের মত, তবু কুলোপানা চক্কর হলেই তো আর দাঁতে কালবিষ থাকে না।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার বললেন, 'ভদ্রলোক জর্মন বলতে পারেন।'

'তাই নাকি?' বলে সেই যে ইংরিজি বলা বন্ধ করলেন তারপর আমি আর কখনো তাঁকে ইংরিজি বলতে শুনি নি।

লাঞ্চ শেষ হতেই হের ওবের্স্ট উঠে দাঁড়ালেন। জুতোর হিলে হিলে ক্লিক্ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্ত্রীকে, তারপর আমাকে 'বাও' করে আপন ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাপের বয়সী লোক, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এরকম 'বাও' করে বসবে কি করে জানব বলো। আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে বার বার 'বাও' করে তার খেসারতি দেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মনে মনে মাদামের সামনে বড় লজ্জা পেলুম। পাছে তিনিও আবার কোনো একটা নূতন এটিকেট চালান সেই ভয়ে—যদিও আমার কোনো তাড়া ছিল না—আমি দু'মিনিট যেতে না যেতেই উঠে দাঁড়ালুম, মাদামকে কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে 'বাও' করে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হলুম—হিলে হিলে ক্লিক্‌টা আর করলুম না, জুতোর হিল্ রবরের ছিল বলে।

চারটের সময় কফি খেতে এসে দেখি হের ওবের্স্ট নেই। মাদাম বললেন, তিনি অপরাহ্নে আর কিছু খান না। মনে মনে বললুম, বাব্বা, ইনি পওহারী বাবার কাছে পৌঁছে যাবার তালে আছেন।

ডিনারে ওবের্স্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ্ আর এক কাপ চা—তাও আর পাঁচজন জর্মনের মত—'বিনদুধে!'

চাচা থামলেন। তারপর গুনগুন করে অনুষ্টুপ ধরলেন,

'এবমুক্তো হৃষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত।'

তারপর বললেন, 'আমি গুড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি জয় করি নি, নিদ্রাই আমাকে জয় করেছেন, অর্থাৎ আমি ইন্‌সমনিয়ায় কাতর। কাজেই সংযমী না হয়েও 'যা নিশা সর্বভূতানাং' তার বেশীর ভাগ আমি জেগে কাটাই। রাত তিনটের সময় শুতে যাবার আগে জানালার কাছে গিয়ে দেখি কর্তার পড়ার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে!

দেরীতে উঠি। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেলুম, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিলুম লোহার নালে নালে এমনি বম্‌শেল্ ক্লিক করে যে, মাদাম আঁৎকে উঠলেন। মনে মনে বললুম,' হিন্দুস্থানীকী তমিজ ভী দেখ লীজীয়ে।'

ওবের্স্টকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি অনিদ্রায় ভোগেন?' বললেন,' না তো। ' আমি কেন প্রশ্নটা শুধালুম সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দশটায় গ্যোটে-পাঠ।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি আমায় গ্যোটে পড়িয়েছিলেন, দুটি শর্ত প্রথম দিনই আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে। তিনি কোনো পারিতোষিক নেবেন না, আর আমার পড়া তৈরী হোক আর না হোক, ক্লাস কামাই দিতে পারব না।

মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শেখা কাকে বলে জানো? বুঝিয়ে বলছি। আমরা দেশকালপাত্রে বিশ্বাস করি; গুরুর যদি শরীর অসুস্থ থাকে, ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধা উপস্থিত হয়, পালা-পরবে যদি কোথাও যেতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের যদি অনটন হয়, শিক্ষক অথবা ছাত্রের যদি পড়া তৈরী না থাকে, গুর্বীর যদি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সংক্রান্ত কোন বিশেষ প্রয়োজন হয়—এবং তখনকার গম-বরাদ্দের (রেশনিঙের) দিনে তার নিত্য নিত্য প্রয়োজন হত—তাহলে অনধ্যায়। কিন্তু প্রাশান মিলিটারি-মার্গ অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবদুর্বিপাকে বিশ্বাস করে না; আমি বুকে কফ নিয়ে এক ঘন্টা কেশেছি, ক্লাস কামাই যায় নি, হিণ্ডেনবুর্গ হের ওবের্স্টকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ক্লাস কামাই যায় নি। একটি বৎসর একটানা গ্যোটে, আবার গ্যোটে এবং পুনরপি গ্যোটে। তার অর্ধেক পরিশ্রমে পাণিনি কণ্ঠস্থ হয়, সিকি মেহন্নতে ফিরদৌসীকে ঘায়েল করা যায়। অথচ পড়ানোর কায়দাটা ন' সিকে ভটচার্যি। গ্যোটের খেই ধরে বাইমার, বাইমার থেকে ট্যুরিঙেন, ট্যুরিঙেন্ থেকে পূর্ণ জর্মনির ইতিহাস; গ্যোটের সঙ্গে বেটোফোনের দেখা হয়েছিল কার্লসবাডে—সেই খেই ধরে বেটোফোনের সঙ্গীত, বাগনারে তার পরিণতি, আমেরিকায় তার বিনাশ; গ্যোটে শেষ বয়সে সরকারি গেহাইমরাট্ খেতাব পেয়েছিলেন, সেই খেই ধরে জর্মনির তাবৎ খেতাব, তাবৎ মিলিটারি মেডেল, গণতন্ত্রে খেতাব তুলে দেওয়াটা ভাল না মন্দ সে সব বিচার, এক কথায় জর্মন দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যোটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।

আর এ সব কিছু ছাড়িয়ে যেত তাঁর আবৃত্তি করার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সেই ইন্দ্রজালের মোহ বোধ হয় আমার এখনো কাটে নি; আমি এখনো বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়—যে-শ্রদ্ধা, যে-অনুভূতি, যে-সংজ্ঞা নিয়ে ডুটেন্‌হফার গ্যোটে আবৃত্তি করতেন— তাহলে ঈপ্সিত ফললাভ হবেই হবে।

পূর্ণ এক বৎসর রোজ দু'ঘন্টা করে এই গুণীর সাহচর্য পেলুম কিন্তু আশ্চর্য, তার নিজের জীবন অথবা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তিনি কখনো একটি কথাও বলেননি। কেন তিনি মিলিটারি ছাড়লেন, লুডেনডর্ফের আহ্বানে জর্মনিতে নূতন দল গড়াতে কেন তিনি সাড়া দিলেন না (কাগজে এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হত), পেন্সন্ কেন তিনি ত্যাগ করলেন, না করে পারিবারিক তৈলাঙ্কন তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত না,—এ-সব কথা যদি বাদ দাও, একদিনের তরে ঠাট্টাচ্ছলেও তাঁকে বলতে শুনি নি প্রথম যৌবনে তিনি সোয়া দুবার না আড়াইবার প্রেমে পড়েছিলেন অথবা ছাত্রাবস্থায় মাতাল হয়ে ল্যাম্পপোস্টকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে কান্নাকাটি করেছিলেন কি না।

পূর্ণ এক বৎসর ধরে এই লোকটির সাহচর্য পেয়েছি, তাঁর সংযম দেখে মুগ্ধ হয়েছি—মদ না, সিগারেট না, কফি না ; বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত-বাতায়ন নিরিন্ধন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা, আত্মসম্মান রক্ষার্থে পিতৃপিতামহসঞ্চিত আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন, আহারে বিরাগ, ভাষণে অরুচি, দম্ভহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ ; গুড়াকেশ—সব কিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে আমি নিজের অজানায় তাঁকে অণুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলুম। ডুটেন্‌হফারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমি যে দস্তানা, ওভারকোট, টাই কলার ছাড়লুম, আজো তা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করি নে। কিন্তু কিসে আর কিসে তুলনা করছি !'

চাচা বললেন, 'শুধু একটা জিনিসে হের ওবের্স্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিনে জিনিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জাতিভেদের কথা ওঠে। আমি মুসলমান, তার উপর ছেলেবেলায় দু' হাত তফাতে দাঁড়িয়ে বামুন পণ্ডিতকে স্লেট দেখিয়েছি, কৈশোরে হিন্দুহস্টেলে বেড়াতে গিয়ে ঢুকতে পাই নি, জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়ার কথা নয়। তার-ই প্রকাশ দিতে হের ওবের্স্ট জাতিভেদের ইতিহাস, তার বিশ্লেষণ, বর্তমান পরিস্থিতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এমনি তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা কতকগুলো কথা বললেন যে আমার উষ্মার চোদ্দ আনা তখনি উবে গেল। দেখলুম, শুধু যে তিনি মনুসংহিতার জর্মন অনুবাদ ভালো করে পড়েছেন তা নয়, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রের তাবৎ আচার অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন—অবশ্য সংস্কৃতে নয়, হিলেব্রান্টের জর্মন অনুবাদে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি, বৈজ্ঞানিক পরশ পাথর দিয়ে বিচার করলে তার কতটা গ্রহণীয় কতটা বর্জনীয়, বিজ্ঞান যেখানে নীরব যেখানে কিংকর্তব্য এসব তো বললেনই, এবং যে সব সমস্যায় তিনি স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে-সবগুলোও বিশেষ উৎসাহে আমার সামনে উপস্থিত করলেন।

অথচ কি বিনয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—প্রাশান কৌলীন্য যেন দম্ভপ্রসূত না হয়। প্রাশান কৌলীন্য জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে না, তার দাবী শুধু এইটুকু যে তার বিশেষত্ব আছে, সে-বিশেষত্বটুকুও যদি পৃথিবী স্বীকার না করে তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু অন্ততপক্ষে পার্থক্যটুকু যেন স্বীকার করে নেয়। হের ওবের্স্ট তাতেই সন্তুষ্ট।তিনি সেইটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সে-পার্থক্যের জন্য 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে।

এবং সেই পার্থক্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দেখতে হবে রক্তসংমিশ্রণ যেন না হয়।

নীটশের সুপারম্যান ?

না, না। শুধু বড় হওয়ার জন্য বড় হওয়া নয়, শুধু 'সুপার' হওয়ার জন্য 'সুপার' হওয়া নয়। প্রধান আদর্শ হবে ত্যাগের মধ্য দিয়ে, আত্মজয়ের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয়

সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার।

এবং যদি দরকার হয়, তার জন্য সংগ্রাম পর্যন্ত করা। সেবা করার জন্য যদি দরকার হয় তবে যে-সব অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ তার অন্তরায় হয় তাদের বিনাশ করা।

আমার কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকল। সেবার জন্য সংগ্রাম ; বাঁচবার জন্য বিনাশ ?

হের ওবের্স্ট বলতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন? সেইটে বার বার পড়তে হয়, বুঝতে হয়। ভুললে চলবে না, জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।'

আমি প্রথম দিনের আলোচনার পরই বুঝতে পেরেছিলুম হের ওবের্স্টের সঙ্গে তর্ক করা আমার ক্ষমতার বহু, বহু উর্ধ্বে কিন্তু এই 'সেবার জন্য সংগ্রাম' বাক্যটা আমার কাছে বড়ই আত্মঘাতী, পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হল। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণ বিসর্জন, এও যেন আমার কাছে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার কোন্ কোন্ জায়গায় বাধছে হের ওবের্স্টের কাছে সেগুলোও অজানা ছিল না।

লক্ষ্য করলুম, এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে। কিন্তু স্বল্প হলে কি হয়, শব্দের বাছাই, কল্পনার ব্যঞ্জনা, যুক্তির ধাপ এমনি নিরেট ঠাসবুনুনিতে বক্তব্যগুলোকে ভরে রাখত যে সেখানে সূচাগ্র ঢোকাবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। এবং আরো লক্ষ্য করলুম যে একমাত্র রক্তমিশ্রণের ব্যাপারেই তিনি যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

বিষয়টি যে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে সেটা বুঝতে পারলুম একদিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন তিনি আমার ঘরে এসে বললেন, 'এত রাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না ; আমাদের আলোচনার সময় একটি কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটি হচ্ছে, 'সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি যিনি সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, একমাত্র তাঁরই অধিকার সেবার ভার গ্রহণ করার, সেবার জন্য সংগ্রাম করার।'

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে হিল্-ক্লিকের সঙ্গে 'বাও' করে বেরিয়ে গেলেন।

এত রাত্রে এসে এইটুকু বলার এমন কি ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল?

হের ওবের্স্টের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, বাড়ির লনে পাইচারি করেছি, পৎস্‌দাম পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে চাষাদের বাড়িতে খেয়েছি, পুরোনো বইয়ের দোকানে প্রাচীন মাসিক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, অধিকাংশ সময় তিনি চুপ, আমিও চুপ। তাঁকে কথা বলাতে হলে প্রাশান ঐতিহ্যের প্রস্তাবনা করাই ছিল প্রশস্ততম পন্থা। একদিন শুধালুম, 'ফ্রান্সের সঙ্গে আপনাদের বনে না কেন?'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'না বলাই ভালো। এ রকম ধ্বংসমুখ দেশ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। প্যারিসের উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস দেখেছেন? কোন্ সুস্থ জাতির পক্ষে

এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?'

আমি বললুম, 'বার্লিনেও 'কাবারে' আছে।'

হেম ওবের্স্ট বললেন, 'বার্লিন জর্মনি নয়, প্রাশার প্রতীক নয়, কিন্তু প্যারিস ফ্রান্স এবং ফ্রান্স প্যারিস।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। সে-সমস্যা মানুষের মনকে অহরহ আন্দোলিত করে শেষ পর্যন্ত সে-সমস্যা নিজের জীবনে, নিজের পরিবারের জীবনে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই নিয়ে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একদিন না একদিন আলোচনা করে। হের ওবের্স্টকে কখনো আলোচনার সে দিকটা মাড়াতে দেখি নি।

ফ্রাউ ডুটেনহফারকে আমি অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প কাহিনী বলতুম। হের ওবের্স্টের তুলনায় যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হত কম, তবুও তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বেশী। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হের ওবের্স্টের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, না জেনে হয়ত আমি এমন বিষয়ের কথা পাড়ব যাতে তাঁর আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশ্বাস তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—তাই এ-প্রশ্ন শুধালুম।'

ফ্রাউ ওবের্স্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখের ভাব থেকে মনে হল তিনি মনে মনে 'বলি কি বলি না' করছেন। শেষটায় ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে গেছে, আমাদের মেয়ে—'

কথার মাঝখানে ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার হঠাৎ দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। এই বেকুব গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতো-পেটা করলুম। অতটা বুদ্ধি কিন্তু তখনো ছিল যে এ সব অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয় মাত্র। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। শ্মশানরা হয়ত তখনো হিল্ ক্লিক করে।

বড় ছেলে মরে যাওয়াতে বয়স্ক চাষাকে একদম ভেঙে পড়তে দেখেছি। তার তখন দুঃখ সে মরে গেলে তার খেত-খামার দেখবে কে। সভ্যতা কুলটুরের পয়লা কাতারের শহরে তারি পুনরাবৃত্তি দেখলুম ডুটেন্‌হফার পরিবারে। এত ঐতিহ্য, এত সাধনা, এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব এসে শেষ হবে এই ডুটেন্‌হফারে?

তাই কি এত কৃচ্ছ্রসাধন, রক্তসংমিশ্রণের বিরুদ্ধে এত তীব্র হুঙ্কার? যে বর্ষায় সফল বৃষ্টি হয় না সেই বর্ষাতেই কি দামিনীর ধমক, বিদ্যুতের চমক বেশী?

তাই হের ওবের্স্টের পড়াশুনারও শেষ নেই। সভ্য অসভ্য বর্বর বিদগ্ধ দুনিয়ার তাবৎ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজগঠন, ধর্মনীতি পড়েই যাচ্ছেন, পড়েই যাচ্ছেন। শীতের রাতে

আগুন না জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঘন্টার পর ঘন্টা পাইচারি, বসন্তে বেখেয়ালে বৃষ্টিতে জবজবে হয়ে বাড়ি ফেরা, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবস বিদেশী মুসলমানকে প্রাশান ধর্মের মূল তত্ত্বে ওকীবহাল করার অন্তহীন প্রয়াস, হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন্ নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো কোণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ।

কিন্তু আমার সামনে তিনি কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নি। এসব আমার নিছক কল্পনাই হবে।

এক বৎসর ঘুরে এল। আমি ততদিনে পুরো পাক্কা প্রাশান হয়ে গিয়েছি। চেয়ারে হেলান না দিয়ে বসি, সুপে গোলমরিচের গন্ধ পেলে ঝাড়া পনরো মিনিট হাঁচি, একটানা বারো ঘন্টা কাজ করতে পারি, তিন দিন না ঘুমুলেও চলে—যদিও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার নিদ্রাকৃচ্ছ্রতা তখন অনেকটা সেরে গিয়েছে—কাঠের পুতুলের মত খট খট করে হাঁটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আমার জর্মন উচ্চারণ শুনে কে বলবে আমি ভাত-খেকো, নেটিব, কালা-আদমী। সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও খানিকটে হল যে হের ওবের্স্টের হৃদয় বলে যদি কোনো রক্তমাংসে গড়া বস্তু থাকে তবে তার খানিকটে আমি জয় করতে পেরেছি।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনের প্রাশান-পর্বকে তার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিল।

কলেজ থেকে ফিরেছি। দোরের গোড়ায় দেখি একটি যুবতী পেরেমবুলেটরের-হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। চেহারাটি ভারী সুন্দর, হুবহু হের ওবের্স্টের মত। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই। আমিও দাঁড়ালুম, প্রাশান এটিকেট যদিও সে-অবস্থায় কাউকে সেখানে দাঁড়াতে কড়া বারণ করে। তবুও যদি কেউ দাঁড়ায় তবে সেই প্রাশান এটিটেরই অলঙ্ঘ্য আদেশ, হের ওবের্স্ট তাকে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনি এটিকেট লঙ্ঘন করলেন,—সেই প্রথম আর সেই শেষ।

আমি তখন আর প্রাশান না। আমার মুখোস খসে পড়েছে। আমি ফের কালা-আদমী হয়ে গিয়েছি। আমি নড়ব না।

মেয়েটি কি বললেন বুঝতে পারলুম না।

হের ওবের্স্ট বললেন, 'তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করবে না। তাই আবার, শেষবারের মত বলছি, তুমি যদি আবার এরকম চেষ্টা করো, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার সন্ধানের বাইরে যেতে হবে।'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। ছুটে গেলাম ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের কাছে। বললুম, 'আপনার মেয়ে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আপনার স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি তাকে হাত ধরে তুলে সদর দরজার দিকে চললুম করিডরে শুনি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, দেখি, হের ওবের্স্ট ফিরে আসছেন। আমি তখন ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটলুম মেয়েটির সন্ধানে। তাঁকে পেলুম বাড়ির সামনের রাস্তায় তখনো কাঁদছেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম, তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। ঋজু, শক্ত, প্রাশান হাতে ওবের্স্টের লেখা। আমার বুক কেঁপে উঠল। খুলে পড়লুম ;—

আপনার কর্তব্যবুদ্ধি আপনাকে যে-আদেশ দিয়েছিল আপনি তাই পালন করেছেন। আমি তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এর পর আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে না।

'আপনার বাড়ি পেতে কোনো কষ্ট হবে না জেনেই বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে আমার বক্তব্য জানালুম।'

হের ওবের্স্টকে ততদিনে এতটা চিনতে পেরেছিলুম যে, তাঁর হৃদয় থাক আর নাই থাক, তাঁর প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না। পরদিন সকাল বেলা ডুটেন্‌হফারদের বাড়ি ছাড়লুম। হের ওবের্স্টের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করি নি। ফ্রাউ কপালে চুমো খেয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আড্ডা এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করল—সকলের হয়ে—'কিন্তু মেয়েটির দোষ কি ছিল?'

চাচা বললেন, 'হের ওবের্স্টের গোর দিতে যাই তার প্রায় বৎসর খানেক পরে। সেখানে শুনলুম, তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, এবং তিনি জাতে ফরাসী।'

মুখুয্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর অধ্যাপক কি বলছিল রে? বর্ণসঙ্কর-ফঙ্কর আবোল-তাবোল কথা? বর্ণসঙ্করের প্রতি দরদ দেখিয়েছিলুম বলে হের ওবের্স্ট তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীকে অকাতরে অপাঙক্তেয় করলেন।'

এবং নিজে? অর্ধ-অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে না তাড়ালে হয়ত তিনি আরো বহুদিন বাঁচতেন। তিনি আর কোনো পেয়িং-গেস্ট নিতে রাজী হন নি। একে নিরম্বু উপবাসে মৃত্যু বলা চলে না সত্যি, কিন্তু এরো একটি পদবী থাকা উচিত। কি বলো গোঁসাই?'

আড্ডায় চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা বলল, 'শেষ ট্রেন মিস করেছি।'

চাচা বললেন, 'চ' প্রাশান কায়দায় পাঁচ মাইল ডবলমার্চ করা দেখিয়ে দি।'

For More Books visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php